মাইকে ঘন ঘন বার্তা দিচ্ছে। এদিক সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে, বসে, লোকজনকে দেখতে দেখতে, মাইকের বার্তা শুনতে শুনতে সারাদিন কেটে গেল। সময় এল জম্মু তাওয়াই ট্রেন ছাড়ার। বিধান দত্ত ট্রেনে চেপে বসলেন। এক অসম্ভব ভাললাগায় জুড়িয়ে গেল তাঁর বুক। জীবনে প্রথমবার ট্রেনে চড়া, তাও আবার বাড়ি থেকে পালিয়ে চুপিসারে। এক এক করে দুই পয়সা বহনকারী প্যান্টের দুই পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে তিনি ট্রেনের জানালার ধারের সিটটি নিলেন। ট্রেন ছাড়ল। তার পু-ঝিক-ঝিক আওয়াজে উদ্বেলিত হয়ে উঠল প্রাণ। তাঁর মনে একবারও বাড়ির কথা উঁকি মারল না। কল্পনায় একবারও এল না যে বাড়িতে তাঁকে নিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয় তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। চার পুত্রসন্তানের সর্বকনিষ্ঠ বিধান দত্তকে নিয়ে বাবা নিশ্চয় হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দিয়েছেন।

ট্রেন ছুটছে দ্রুত গতিতে। তখন শহরে তো বটেই শহরের বাইরের দিকটাতেও জনবসতি অনেক কম ছিল। শহরতলীও এখনকার মত এত প্রসারিত ছিল না। শহরতলী ছাড়িয়ে, ছোট ছোট গ্রামগঞ্জ ছাড়িয়ে অবসন্ন শীতের অথবা আসন্ন বসন্তের রাতে অনতিবিলম্বে বিধান দত্ত প্রকৃতির সংস্পর্শে এলেন। মানুষেরই তৈরি ট্রেন এবং ট্রেনে সহস্র মানুষ আরোহীদের মধ্যে থেকে প্রকৃতিকে চিনলেন আলাদা করে। এ যেন এক নতুন পৃথিবী, অন্য পৃথিবী, এই পৃথিবী তিনি আগে কখনও দেখেননি। সত্যিই কি দেখেননি? নিজের মনের কাছে নিজেই প্রশ্ন রাখেন বিধান দত্ত। উত্তর পেয়েও যান অবিলম্বে। না দেখেছেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত বসিরহাট টাউন থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরের ইতিন্দা গ্রাম তাঁকে শৈশব থেকেই প্রকৃতিকে দেখার অনেক সুযোগ দিয়েছে, প্রকৃতিকে চেনার অনেক সুযোগ দিয়েছে। গ্রামের গাছগাছালি, নদী, পুকুর কাঁচা রাস্তা, কাদামাটি, ধানক্ষেত, পাটক্ষেত সবকিছুই তিনি দেখেছেন—তবু—তবু আজ—কেন তিনি নিজেও জানেন না—মনে হচ্ছে তিনি কিছুই দেখেননি—অথবা ঠিক এভাবে দেখেননি যেভাবে আজ দেখছেন। মনে হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা তাঁর শরীর থেকে পুরনো চোখদুটোকে সরিয়ে তার জায়গায় দুটো নতুন চোখ বসিয়ে দিয়েছেন। তাই আজ তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে শুধু দেখছেনই না, তার রূপকে আস্বাদনও করছেন। গাছপালা, লতাপাতা, খাল-বিল, নদী-নালা, ঘরবাড়ি, লাইট পোস্ট তাঁকে দ্রুত বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চোখের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিধান দত্তের মনে হচ্ছে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সারথী হয়ে সপ্ত ঘোড়াকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন সীমাহীন আকাশপথে।

ট্রেনে ফেরিওয়ালা নানা জিনিস নিয়ে চড়ে হেঁকে হেঁকে এক কম্পার্টমেন্ট থেকে অন্য কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছে। খাবার নিয়েও চড়ছে ফেরিওয়ালা—সিঙ্গারা, চপ, কচুরি, লুচি-তরকারি। বিধান দত্তের এখন এসব খেতে ইচ্ছে করছে না। উঠল মুড়িওয়ালা—মুড়-হি, মুড়-হি। দুই পকেট থেকে দুই পয়সা বের করে বিধান দত্ত মুড়িওয়ালাকে বলেন, "আমায় দু'পয়সার মুড়ি দেবে ভাই?"

"কেন দেব না?"

"মাত্র দুই পয়সা তো তাই।"

"তাতে কি হয়েছে? খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

লোকটি বাদাম, তেল মাখিয়ে মুড়ি দেয়। বাদাম, মুড়ি খেতে খেতে এবং প্রকৃতি দেখতে দেখতে একেবারে শূন্য পকেট নিয়ে বিধান দত্ত কলকাতা তথা বাড়ি থেকে দূরে চলে যেতে থাকেন।

বিধান দত্তের মনে পড়ে যায় বড়দার কথা। পরীক্ষায় অঙ্কের প্রশ্নের উত্তরে বাংলা কবিতা লিখে জমা করার কয়েকদিন পরের ঘটনা। রোজকার মতো সেদিনও তিনি বাড়ির পাশের পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন। সঙ্গে আছে পাড়ার বন্ধুবান্ধব। হঠাৎ বড়দা এসে প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করলেন, যে সবথেকে বেশিবার পুকুরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সাঁতার কেটে গিয়ে সাঁতার কেটে ফেরত আসতে পারবে তাকে এক সের রসগোল্লা

পুরস্কার দেওয়া হবে। সবাই হুড়মুড় করে নেমে পড়ল প্রতিযোগিতায়। জোর কদমে। কিন্তু কমবেশি গতি নিয়ে দু'চারবার চক্কর লাগিয়েই হাঁপাতে শুরু করল সবাই। একমাত্র বিধান দত্ত ব্যতিক্রম। তিনি সাঁতার কেটে চলেছেন আর বাকিরা এক এক করে হার মেনে পুকুর পাড়ে বসে পড়ছে। ৩২বার পারাপার করে বিধান দত্ত থামলেন। পেলেন এক সের রসগোল্লা। জেতার আনন্দ ভাগ করে নিলেন পরাজিতদের সঙ্গে।

মনে পড়ে মায়ের কথা। বিধান দত্তের বয়স তখন বছর দশেক। প্রতিবারের মত সেবারও পাড়াতে দুর্গাপুজো হচ্ছে। কিন্তু প্রতিবারের মত সেবার দাদারা কেউ মণ্ডপে নৈবদ্য নিয়ে যেতে রাজি হননি। তাই মা বিধান দত্তকে বললেন, "যাও, সুবল পুরোহিতকে নৈবদ্যটা নিয়ে এসো।" ইতিন্দা স্কুলের সুবল মাস্টার সুবল পুরোহিতও বটে। পুজোপার্বণে তিনি বহুরূপীর মতো মাস্টারের চেহারা পরিবর্তন করে পুরোহিতের চেহারা নিয়ে ফেলেন। নিম্নাঙ্গে প্যান্টের বদলে ধুতি চড়িয়ে খালি গায়ে হাতে ছাত্র পেটানোর বেতের বদলে কুশন নিয়ে এই বাড়ি থেকে সেই বাড়ি, এই মণ্ডপ থেকে সেই মণ্ডপ করেন।

দুর্গাপুজো দত্তবাড়ির নৈবদ্য মানে বিশাল বারকোশে বিশাল পরিমাণ কদমা, বাতাস, জিলিপি, রসগোল্লা, সন্দেশ, রসকদম, ক্ষীরকদম এবং ফলমূল। বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে দায়িত্ব পালন করেন বিধান দত্ত।

পুজোশেষে প্যান্ডেল থেকে ফেরত এল বারকোশ। মা দেখলেন তাতে পড়ে আছে মাত্র চারটে বাতাসা এবং দুটো কদমা। তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, "একি আমি তো রেকাবি ভরে ভোগ দিয়েছিলাম। কয়েকটি ছাড়া সবই ফেরত আসার কথা। আমার তো বাড়ির সকলকে, আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের প্রসাদ বিতরণ করতে হবে!"

"আমি জানি না মা। আমাকে সুবল ঠাকুর এততুকুই দিয়েছে," পালিয়ে যান বিধান দত্ত।

রাগে গজগজ করতে করতে মা সুবল ঠাকুরকেই ধরেন, "সুবল আমি বারকোশ ভরে নৈবদ্য বিধানের হাতে পাঠিয়েছিলাম। তুমি চারটে বাতাসা আর দুটো কদমা ফেরত পাঠিয়েছ কেন?"

"ক্ষমা করবেন বউদি, বিধান আমাকে চারটে বাতাসা আর দুটো কদমাই দিয়েছিল। আমি নিজেও অবাক হয়েছিলাম দত্তবাড়ি থেকে এত কম নৈবদ্য কেন এল ভেবে।"

"কি বলছ! আমি পঞ্চাশটা কদমা দিয়েছি। দু'কেজি বাতাসা দিয়েছি। ফলমূল ভরে দিয়েছি।"

"না বউদি, কোথাও তো ভুল হচ্ছে। বিধানকে ডাকুন।"

ডাকা হল বিধানকে। মা বললেন, "শোনো সুবল ঠাকুর কি বলছেন।"

"আমি জানি না মা," আবার সেই একই উত্তর। "কে কি বলছে আমি বুঝি না। আমি একটু ব্যস্ত আছি," বলেই আবার তিনি পালিয়ে যান। রাতে বাড়ি ফিরলে মা জিজ্ঞেস করেন, "পেটে ঢুকিয়েছ বুঝি সব?"

বিধান চুপ।

"কোথায় বসে করলে অকাজ?"

"বসিনি। পাটগাছের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করেছি।"

মনে পড়ে সেজদা কথাও। চান্দ্র মাঘের শুক্লা পঞ্চমী তিথি। চারখানা খুঁটি পুঁতে কাপড় দিয়ে ঘিরে সমিতির মাঠে প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে। হ্যাজাক জ্বালিয়ে সরস্বতি পুজো হবে। পুজোর চাঁদা তুলতে ছোট্ট বিধান দত্তেরও অবদান অনেক। কয়েকদিন আগে অসময়ের বৃষ্টির কবলে পড়ে গ্রামের কাঁচা রাস্তা বর্ষাকালের মতই চলাফেরার অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। হাঁটুসমান কাদা। রাস্তা নাকি কর্দমাক্ত মাঠ বোঝা দায়। বাড়িতে অনেক গুরুজন আছেন—মা, বাবা, বড়দা, মেজদা, সেজদা, কাকু, কাকী, পিসি, জেঠা, জেঠি। সবচেয়ে গম্ভীর গুরুজন হলেন বড়দা। কাদায় প্যান্ট নোংরা হলে তাঁর বেত্রাঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। তাই বর্ষাকালে বিধান দত্ত প্যান্ট

খুলে নেংটি পরেই চলাফেরা করেন। এখন সরস্বতী পুজোর আগে প্রকৃতির এমন বাধা সহ্য হয় না। নেংটি পরে ঘুরে বেড়ানো যায়, দৌড়ঝাঁপ করা যায়, ছি-বুড়ি খেলা যায় কিন্তু চাঁদা তুলতে যাওয়া যায় না। হঠাৎ বিধান দত্তের মাথায় এক বুদ্ধি এল। বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তিনি পঁচিশ তিরিশখানা কলাগাছ কেটে তাদের কাণ্ডগুলো দমাদম ফেলে দিলেন কাদার ওপর। নিজেদের তথা লোকজনের পথ চলতে সুবিধে হল তাতে। বেশ কিছুদিন থেকে একজন পাঞ্জাবি বাবুকে গ্রামে সাইকেলে করে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। কোথায় থেকে তাঁর গ্রামে প্রবেশ ঘটেছে কারও জানা নেই। নিশ্চয় তিনি সরস্বতী পুজো নিয়ে মাতামাতি করার মহলে বড় হননি, নিশ্চয় বোঝেন না সরস্বতী ঠাকুরের মহিমা কি। তাই বিধান দত্ত তাঁর কাছে চাঁদা চাইলেন না। পাঞ্জাবি বাবু বিধান দত্তের ফেলা কলাগাছের উপর দিয়ে কাদার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গেলে বিধান দত্ত এবং তাঁর মিত্রমণ্ডল পাঞ্জাবি বাবুর কাছে শুল্ক চাইলেন। শুল্ককেই পুজোর চাঁদা হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু পাঞ্জাবি বাবু পয়সার দিকে গেলেন না। তিনি তাঁর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে কয়েক মুঠো বাদাম বের করে বিধানের দত্ত এবং তাঁর বন্ধুদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। তাতেই তিনি খুশি। কি জানি পয়সা পেলেও হয়ত তিনি তা দিয়ে বাদামই কিনে খেতেন। বাদাম বিধান দত্তের খুব পছন্দ।